চাঁদের হাট কিংবা গঙ্গাসাগর মেলা

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

গ্রীষ্মকালের শেষ, আমেরিকার মধ্য-উত্তরাঞ্চলের ছোট শহর রিভারফলস্ এ শনিবারের সকাল। শান্ত নির্জন, সুন্দর। আর হবে নাই বা কেন? এই শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আছেটাই বা কি?

চায়ের ধূমায়িত কাপটা নিয়ে বাইরের ছোট বারান্দাটা গিয়ে বসি। বাবা আর ছেলে দুইজনেই ঘুমোচ্ছে, আমারই পোড়া চোখে ঘুম নেই!

দেখতে দেখতে বছরগুলো চলে গেল! কোলের ছেলেটা স্কুল পাশ করে, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী করার জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর বাড়ির বাইরে থাকলো, এখন আবার প্রোডাকশন ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে দূরে সেই কোন পশ্চিম বেলাভূমিতে চলে যাবে, সেই বিরতির মাঝের একটা সপ্তাহ বাপ-মায়ের কাছে এসেছে, বাড়িতে থাকবে। ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে ছুটিটা...

তাও ভালো, ওর বয়সী ছেলেরা বাড়ীতে এসেই কফির আড্ডায় চলে যায়, ঋক ঘরে ঢুকেই আমার রান্নাঘরের বাগান দেখতে চেয়েছে, সেখানে টমেটো, বেগুন, জুকিনি বেল পেপারের সমাহারে অভিভূত হয়েছে, প্রশংসা করেছে। খাবার ঘরে ঘুরে ঘুরে গল্প করেছে, 'মা তুমি কি চুলে নতুন ছাঁট দিয়েছো? ভালো হয়েছে, ইয়াং দেখাচ্ছে।' ওর বাপের তো এই সব দিকে কোন খেয়ালই নেই!

ঋকের শিশু মুখটা মনে পড়ে, আমি ছেলে চেয়েছিলাম, অভিরূপ চেয়েছিল মেয়ে। ঋক ছোটবেলাতেই কি সেটা জানতে পেরে গিয়েছিল? পাঁচবছর বয়স থেকেই আমার সাথে ঘুরে ঘুরে বাজার দোকান করতে আর একটু বড়ো হয়ে বাপের সাথে কম্প্যুটারে ভিডিও খেলা দুদিকেই সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে ছেলেটা। নাঃ, মেয়ে না হওয়ার কোন দুঃখই আমার নেই।

কলেজে পড়াকালীন বাড়িতে এলে আমাদের মায়ে-পোয়েতে এই সকাল বেলার গল্পটা জমতো ভালো, আজকে ওকে ডাকতে গিয়েও থমকে গেছি – 'মা, বড়ো কাজ নিচ্ছি, অনেক কাজের চাপ থাকবে, আবার যে কবে আসবো জানিনা, একটু বেশি বেলা অব্দি ঘুমোবো, কিছু মনে করো না যেন।'

ছেলেটা সেই ছোটবেলা থেকেই সংযত আত্মসংবৃত। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে যে, কবে সেই একটুকরো বাচ্চাটা সংসার অরণ্যে নতুন একটা গাছ হবে? ফুলে ফলে ভরে উঠবে? ওর টুকটুকে লাল শাড়ি পরা বউ কি আমাকে 'মা', 'মাম্মি', 'মিসেস স্যানিয়াল', নাকি স্রেফ 'সুগতা' বলেই ডাকবে? কোথা থেকে জমা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, একটা দীঘল চোখের কুসুম-কোমল বউকে ওর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতাম যদি! সেই একা-একা থাকবে?

প্রেম? নাঃ, আমার ছেলে পথ এখনও সেই পথ মাড়ায় নি। পড়াশোনা, সাঁতার, দাবা, ম্যাথ-অলিম্পিয়াড, আবৃত্তির মাঝখানে ওর স্কুলের, কলেজের বান্ধবীদের সাথে আলাপ হয়েছে, ঋকের সাথে ওদের ভাব কোনদিন নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়, হ্যালোউইনের দিনে ওর মেয়ে-বন্ধুদের সাথে রাজকন্যে সেজে সেই আটবছরের ছেলেটার সে কি আনন্দ! ওর কলেজ জীবনেও দেখেছি, ওর বয়সী অন্য ছেলেরা যখন 'মাচো' প্রতিযোগিতায় কে কত পুরুষালী সেই প্রর্দশনীতে ব্যস্ত, আমার ছেলে শান্ত, ধীর, সমাহিত। ঋকের আগুনে জ্বালা নেই, ওর মেয়েবন্ধুরা ওর সান্নিধ্যের উত্তাপে স্নিগ্ধতা আহরণ করে! দু-একটা ছেলেকেও বাড়িতে নিয়ে এসেছে ঋক, ওরাও যেন ঋকেরই মতো! নরম, দেখলে মমতার উদ্রেক হয়।

হাতে চায়ের কাপটা ঠাণ্ডা... শেষ চুমুক দিই। তবে কি কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে বউ আনতে হবে আমায়?

এটা কি একটা নালিশ? হাসি পেয়ে যায়, ছিঃ। ওর বয়সী অন্য ছেলেরা একের পর এক মেয়ে বন্ধু পরখ করছে, আমার ছেলে 'মিস রাইট' এর অপেক্ষায় আছে। হ্যাঁ, ঋক ওর বাপের মতো। আমিই তো অভিরূপের জীবনে প্রথম মেয়ে।

তবে? এটা মেনে নিতে অসুবিধে কোথায়? হ্যাঁ?

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে ওঠে। পৃথা।

'সাত সকালে কি মনে করে ভাই?'

'বড়ো মুশকিলে পড়েছি, একটা উপকার দরকার।' পৃথার সোজাসাপটা কথা। 'অর্ক স্কুল পাশ করে কলেজে যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটির ডর্মে থাকতে চায়, ওর মেয়ে বন্ধুটিও এই এক জায়গায়, বাবা-মায়ের হোটেলের সুবিধতে ছেলের অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আমায় একগাদা জিনিস বয়ে মরতে হবে!'

'আহা চটছো কেন? কলেজে পড়তে যাওয়া মানে আরো একটু স্বাধীনতা, বোঝো না?' ইউনিভার্সিটির ডর্মিটরি, প্রকারান্তরে দেশলাই বাক্সের ছোট ছোট খুপরি সমৃদ্ধ বহুতল বাড়ি। কিন্তু যখন-তখন ক্লাসের জন্য আদর্শ।

'তোমার ভ্যানটা দরকার... আসতে পারবে এখনই?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমার ভ্যান বলো কেন, ওটা তোমার-আমার-সবাকার, এই ছোট্ট জীবনে আমার-তোমার কোরো নাকো বন্ধু, এখনই আসছি।' আমি চটপট জবাব দিই।

পৃথার বাড়ি আমার বাড়ি থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার পথ।

'পিছনের দরজা নিয়ে জিনিসপত্র তুলতে হবে, সেই বুঝে গাড়ি পার্ক কোরো, সুবিধে হবে,' ফোন রাখার আওয়াজ পাই।

'কিগো? সাতসকালে কার ফোন?' চোখ কচলাতে কচলাতে অভিরূপ দেখা দেয়।

সম্প্রতি চোখে চশমা নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখি। ঘুম থেকে উঠে এসেছে, এক হাতে গত রাত্রের জলের গেলাস, অন্য হাতে ভাঁজকরা স্লিপিং গাউন, এলোমেলো কাঁচা-পাকা-চুল। কপালের সামনে মাথাটা বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে, মেরেকেটে আর এক-আধটা দশেক! তারপরেই আমার শ্বশুরের প্রশস্ত কপাল দেখা দেবে!

মমতা জড়িয়ে বলি, 'যাঃ, তোমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো তো! পৃথা ফোন করেছে।'

জীবনের পঁচিশটা বছর আমার সাথে কাটিয়ে অভিরূপ এখন আফশোস করে, ওর নাকি সারা জীবনটাই ভোগান্তি আর ব্যর্থতা। 'তোমার সাথে দুনিয়ার লোকের পরিচয়! তা হঠাৎ এতো সকালে?'

রাগ হয়, কণ্ঠস্বরে সমপরিমান উষ্মা আর অনুকম্পা মিশিয়ে বলি, 'এমন কিছু সকাল নয় তো! প্রায় আটটা বাজে! বেচারী মুশকিলে পড়েছে....'

অভিরূপ মাথা চুলকায়, আহত স্বরে বলে 'কাল বড্ড দেরী হলোনা ঘুমোতে?'

আমার যেন আর বয়স হয় নি! সারাজীবনই একটা ধেড়ে ছেলের 'মা-গিরি' করে গেলাম।

দাঁত খিচিয়ে বলি, 'দেখো অসুবিধায় পড়েছে, ওর ছেলের জন্য বড়ো ভ্যানটা চাই, বাড়ি থেকে ডর্মে যেতে হবে, আমি বেরোলাম।' চাবির গোছা আর সেল ফোনটা ব্যাগের ভিতরে রাখি।

'তুমি একা সামলাতে পারবে? মাল টানাটানির ব্যপার আছে! দাঁড়াও, অপেক্ষা করো, আমিও বেরোচ্ছি।' দাঁত খিঁচানিতে অভিরূপও কম যায় না। নারী পৃথিবীর বোঝা বইবে, তাও আবার হয় নাকি? সক্ষমতার ক্ষেত্রে অভিরূপ পুং-শ্রেষ্ঠত্ববাদে বিশ্বাসী।

'চলো, বলছো যখন... ঋক তো ঘুমোচ্ছে, ও ওঠার আগেই আমরা ফেরত চলে আসবো।' আমি নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিই, অভিরূপ আসবে বলে যে স্বস্তি পেলাম সেটা ওকে না জানালেও চলবে।

'ঠিক আছে, আমি দুই মিনিটের মধ্যে কফিটা নিয়ে আসি, তুমি গুছিয়ে নাও,' গ্যারাজ খোলার আওয়াজ পাই।

শনিবার, উইকেন্ড বলে কথা। বাড়ির ইন্সট্যান্ট নেস্‌কফিতে অভিরূপের নেশা মেটে না, তাই বাড়ি থেকে একমাইল দূরের দোকান 'স্টারবাক্‌স' থেকে মোকা-লাটে ওরফে গ্যারগেরে মিষ্টি মেশানো কফি কেনার জন্য অভিরূপকে সময় দিতেই হয়। পরিমাণমতো ক্যাফিন এবং চিনির ডোজ না পড়লে কোনো ভদ্রলোকেরই ঘুম ভাঙে না, এটা কে না জানে?

ও যতক্ষণ না ফেরে, গাড়িতে বাজানোর জন্য কয়েকটা গানের ক্যাসেট বেছে রাখি, ঋকের জন্য জল-খাবার টেবিলের ওপর সাজাই, চার জোড়া গ্লাভস, জিনিসপত্র বাঁধার জন্য মোটা দড়ি, মাল বইবার ট্রলি, ওয়াটার-কুলারে জল, গ্যারাজের সামনে গুছিয়ে রেখে বাইরে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করি। আধঘন্টা পরে বাবুর উদয় হয়।

'কি করছো? তাড়াতাড়ি করো, উঠে এসো গাড়িতে', জানলা থেকে মুখ গলিয়ে অভিরূপ আমাকে ডাকে।

নিজে আধঘন্টা বাদে এসে এখন আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলল? ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাত-ঘড়িতে সময় দেখি। আমি পুরোনো-পন্থী, এখনও হাতে ঘড়ি পরি বলে আমায় অনেক কথা শুনতে হয়! 'পৃথাকে বলেছিলাম এখনি বেরোচ্ছি, একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।' যেন জোরে জোরে কথার মাধ্যমে ভাবছি।

'এতো ব্যস্ত হয়ো না তো? যেমন একটা বিদঘুটে ঘড়ি! পরেছো বলেই ঘন ঘন দেখতে হবে? হুট করে বেরোলেই হলো? সব নিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে বেরোতে হবে তো!' জানি কথা বাড়ালেই বাড়বে, একটা গান চালাই, সিটে মাথাটা এলিয়ে দিই।

আজ বাড়ি ফিরে ঋকের সাথে একটা ফয়সালা করতেই হবে, ওর যদি মনে মনে কারোকে ভালো লেগে থাকে আমাদের বলুক, তা না হলে কলকাতায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেয়ে খুঁজবো।

আমাদের বিয়েটাও তো ওই রকম করেই হয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপি, কোথায় গেল সেই সব দিনগুলো? আমাদের দুজনের সম্পর্ক এখন শুধু থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়।

'কি গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' অভীরপের কথায় চমক ভাঙে, 'কাল চেক আর্কিওলজি থেকে উঠে আসা একটা খবর দেখে বড্ড বিরক্ত লেগেছে, রাতে ঘুম আসছিল না! সত্যি বিজ্ঞানীরদের যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। এইসব করে এই প্রজন্মের ছেলেপিলেদের মাথা খারাপ করছে'।

'ওই 'সম...দের' নিয়ে তো.?' এমনকি অভিরূপের কাছেও পুরো শব্দটা বলতে আমার বাধো বাধো ঠেকে। কিছু সংস্কার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। 'যা বলেছো!'

যাক, তবু এতক্ষণে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা করার মতো একটা বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে! 'আমিও পড়েছি খবরটা।' কিছুদিন আগে খবরে বেরিয়েছিল। মাটি খুড়ে চেক আর্কিয়োলজিস্টরা একটা মমি পেয়েছেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার মমি। মজার জিনিস হলো, মমিটি একটি প্রকৃতিগত ভাবে ছেলের

হওয়া সত্ত্বেও তাকে কবরে শোয়ানো রয়েছে এমন কায়দায় যা দেখে মনে মতে পারে ওটি একটি মেয়ের। তাই থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে নিয়েছেন, এই মমি-রূপ ছেলেটি একটু 'বেশি মাত্রার মেয়েলি' ছিলেন! কি যন্ত্রণা! 'কিছু না, এই যুগের কিছু ছেলের 'অস্বাভাবিকতা'কে 'ন্যাচারাল' দেখানোর চেষ্টা।' কয়েক হাজার বছর আগেকার একটা পুরুষ মমিকে সমকামী বলে নির্দিষ্ট করে নিতে পারলেই এখনকার কয়েকটা এঁচোড়ে পাকা ছেলেপুলের অস্বাভাবিকতাকে মেনে নেওয়া যাবে? এই সব বাজে জিনিষে আমরা স্বামী-স্ত্রী বিশ্বাস করি না।

কফির কাজ শুরু হয়েছে, অভিরূপ উত্তেজিত স্বরে আমায় সর্মথন করে, 'প্রমাণ হয়ে গেল পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর আগেও ওইসব, কি বলে যেন? নপুংসক গে-লেসবিয়ান ছিল? কি? না, মমিটি বামদিক ফিরে শুয়ে, আর তার মুখ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে, তাতেই এতো বড়ো একটা জিনিষ প্রমাণ হয়ে গেল?'

'আহ! সকাল বেলায়, হাইওয়ে এর ওপরে, অত জোরে জোরে অমঙ্গুলে শব্দগুলো না বললেও চলবে।' আমি অভিরূপের শব্দনির্বাচনের প্রতিবাদ করি, 'না, কিচ্ছু প্রমাণ হলো না! মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, ওই অত হাজার বছর আগে এই সব ছিলোই না, যত রাজ্যের আজগুবি!' সারা জীবনের শিক্ষা তো একদল বৈজ্ঞানিকের মনগড়া একটা চিন্তায় নস্যাৎ দেওয়া যায় না! ভাগ্যিস আমরা এই রকম, 'স্বাভাবিক' 'ঠিক-ঠিক'। একটা হাত বাড়িয়ে অভিরূপের একটা হাত নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করি।

'কি হলো কি তোমার? কফিটা আরেকটু হলে পড়তো!' অভিরূপ বিরক্ত গলায় বলে।

'ভুল হয়ে গেছে গো, দুঃখিত।' আমি সরে বসি।

'ভুলে যেও না সুগতা, নিজেদের মধ্যে হাসাহসি, খুনসুটি, বিনা কারণে পরস্পরকে ছোঁয়ার দিন চলে গেছে আমাদের।'

ছেলে বড়ো হয়েছে।

দূর থেকে দেখতে পাই, পৃথার বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো সংসার। মোরাম বিছানো রাস্তায় মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে শুরু করে জুতো রাখার তাক। দুটো সুটকেস, তিনটে প্যাকিং বক্স, মায় একটা ছোট রেফ্রিজারেটারও রাস্তা আলো করে তৈরী হয়ে আছে। হোষ্টেলের ঘরে অর্কর যাতে কোন অসুবিধে যাতে না হয় ওর মায়ের সেই চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই অর্ককে আবিষ্কার করি। গাছের আড়ালে কানে একটা ছোট হেডফোন গুঁজে একটা বিরাট প্যাকিংবাক্সের ওপর বসে গানের তালে তালে পা ঠুকছে। হাতের ফোনে সম্ভবতঃ বান্ধবীর সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছে। পৃথা আমাদের শব্দ পেয়ে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়। ওর থমথমে মুখ আর গজগজ থেকে অনেক কিছু আন্দাজ করে নিতে পারি। 'এই তোমাদের আসার সময় হলো? কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর একজনের তো বাড়িতে তো কোন কাজ নেই! ছাই ফেলার ভাঙা কুলো আমি যখন আছি। আমাদের নিজেদের ভ্যানটা আমাদের তো কাজে লাগে না!'

'কি হল কি! তোমার সুপারস্টার বর কি করলো আবার?' পৃথার বর সাগ্নিককে একে মারাদোনার মতো দেখতে, তার ওপর ভালো ফুটবলে খেলে। শহরে হাই-স্কুল-পড়ুয়া ছেলেদের ফুটবল কোচ; বিনা পয়সার স্বেচ্ছাসেবক। প্রতি শনি-রবিবার সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত খেলা শেখায়, ছেলেদের হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করে, মাঝে মাঝে আবার সিনেমা, একজিবিশনেও নিয়ে যায়। আমাদের বাঙালি মহিলা-মহলে দু-একজন প্রকাশ্যেই পৃথার স্বামীভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বোধ করে।

'আমার কর্তাটিও দেখো না! ওর জন্যই তো দেরী হলো, সাগ্নিক তবু তো....'

পৃথার কণ্ঠস্বর এবার উঁচু পর্দায়, 'তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না!' তারপর অভিরূপের দিকে ফিরে তাকায় 'আজকেই একটা ফাইনাল-গেম আছে, টিমের সাতটা ছেলেকে রাইড দিতে হয়েছে, কোচ না থাকলে দল গো-হারা হারবে, পৃথিবী রসাতলে চলে যাবে। জানো না?'

'আ...রে, ঠিক আছে... চিন্তা কী? পড়শি আমি...আমরা সব আছি তাহলে কি করতে? এই বিদেশ বিভুঁইতে? হ্যাঁ?' অভিরূপ ওর বিখ্যাত অমায়িক হাসি হাসে, অভয় প্রদানের মুদ্রায় ওর হাত ওপরে তোলা। ওকে হাসলে এখনও কি সুন্দর দেখায়, অথচ ঘরে বাইরে আমরা দুইজনে এখন শুধুই দুই পরস্পর বিরোধী দল।

'সাগ্নিক একটা দারুণ ভালো কাজ করছে পৃথা,' আমি পৃথার মনে রোমাঞ্চ জাগানোর চেষ্টা করি, 'দেখো গিয়ে, কতো লোক সপ্তাহান্তে এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আলসেমি করে এখানে ওখানে কফি কিনতে বেরোয় এই শনিবার সকালে...' 'তুমি থামো। একসাথে সংসার করতে হলে বুঝতে, আমার জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।' পৃথা এই নিয়ে কোন আলোচনা চায় না।

চারতলা বিল্ডিংয়ের সামনের চত্তরটা গিজগিজ করছে মানুষ। নানা আকৃতি, নানা প্রকৃতির মানুষ।

বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন রঙের, জীবনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উঠে আসা নারী-পুরুষ। একেবারে মেলা বসে গেছে।

'বাপরে! দেখেছো কান্ড!' আমি অভিরূপকে ঠেলা দিই, 'এ যে একেবারে চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছে!'

'যত দিন বাড়ছে, লোক বাড়ছে... হবে না? আমাদের ছেলে ছোট্ট শহরের কলেজে গেছে তাই জানো না, এমনিই হয়।' অভিরূপের সহজ উত্তর, আমার কথাকে ও সচারাচর পাত্তা দেয় না।

'গঙ্গাস্নানের মেলাও বলতে পারো, বিদ্যার্জনের ভিড়,' পৃথা আমার কথায় সায় দেয়।

ছোট্ট এলিভেটরে চার-পাঁচ জনের বেশি ধরে না, তারই মধ্যে একটা ছোট প্যাকিং বাক্স, টিফানী ব্র্যাণ্ডের কায়দার ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প নিয়ে কোনরকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে আমি একটু জায়গা করে নিই। অর্ক আর পৃথাকে ভিড়ের মধ্যে দেখি, কিন্তু ততক্ষণে এলিভেটর উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

অর্কর ঘর চারতলায়। ডানদিকের দেওয়ালের একেবারে শেষে। অসুবিধে হবে না।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে দু'ধারে লম্বা করিডর। করিডরের দুই পাশে ঘর, এক একটা ঘরে দুই জনের থাকার ব্যবস্থা। ঘরের গায়ে দুটো করে নাম টাঙানো।

এইখানেও ভিড়, জিনিষপত্রগুলো সাবধানে বার করে নিয়ে অর্কর ঘরের দিকে যেতে শুরু করি। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না।

ছোট্ট করিডোরের মুখে দাঁড়িয়ে ঘরোয়া আলোচনায় ব্যস্ত ওয়াকার দম্পত্তি। ট্যাক্স উপদেষ্টা ষাটোর্দ্ধ মিঃ জশুয়া ওয়াকার আঠেরো বছরের হোটেল-নাচিয়ে মরিয়মকে বিয়ে করে এই ছোট্ট শহরে সাড়া ফেলেছিলেন। তখন ওনার আগের পক্ষের ছেলে বিলের বয়স চোদ্দ। বড়োলোক পাড়ায়, বিরাট বাড়িতে থাকেন। ক্রিসমাসের সময় ওনার বাড়ির সামনে প্রদর্শনী দেখার জন্য অন্য শহর থেকে লোক আসে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের বাম হাতের অনামিকায় চোখে পরার মতো বড়ো হীরের আংটি। গলায় সোনার চেনে, রত্নখচিত ক্রুশে বিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের ছবি ঝোলানো।

বড়োলোকের ছেলে বিল, দামী প্রাইভেট কলেজে না গিয়ে এখানে কি করছে? আমার মনে হলো, আমাকে দেখতে পেয়েই যেন ডর্মের দেওয়ালে আর্টেমিসিয়ার ছবি 'ম্যাডোনা আর শিশু' না কি সালভাদর ডালির 'দ্য ব্যাসকেট অফ ব্রেড' সেই মধুর বির্তকের উৎসাহটা একটু বেড়ে গেল।

'দুটোই থাকুক, কি এমন দাম? দশ বারো গ্রান্ড বই তো নয়?'

'না না পাগল? কি যে বলো!' মারীয়ম হাতের ছোট্ট পশমের ব্যাগ দিয়ে স্বামীর পিঠে মারেন।

'আপনাদের আলোচনায় একটু ব্যাঘাৎ ঘটানোর জন্য দুঃখিত, কিন্তু একটু পাশ পাওয়া যাবে কি?' আমি প্রশ্ন করি।

'নিশ্চয়ই,' মিসেস মরিয়ম মিহি গলায় জবাব দেন। আর্দ্র গলার স্বরে যোগ করেন, 'এখনই আমরা চলে যাবো,' তুলতুলে নরম ব্যাগ থেকে কাগুজে রুমাল বার করে চোখের নিচে ধরেন, 'আর্ট সেন্টারে 'ফ্যানটম অফ দা অপেরা'র টিকিট কাটা আছে, প্রায় ছয়মাস আগে থেকে, বক্স অফিসের সিট...' চোখের কোণা দিয়ে দেখি, মাথাতে দেড় ফুট লম্বা, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, 'আর কিছু চাই তোমার? তোমাকে ভীষণ মিস করবো...' 'আমি ঠিক থাকবো!' বিলের চাপা গলার উত্তর শুনি।

লম্বা করিডর ধরে হাঁটি। চিন্তা করি, অন্ততঃ দেড়ঘন্টা পরেও যদি আমাদের কাজ মিটিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারি, পৃথাকে ওর বাড়ি পৌঁছিয়ে রিকের সঙ্গে শনিবারের কিছুটা সময় অন্ততঃ কাটাতে পারবো। অর্কর কথাও ভাবি, কলেজ পড়াকালীন প্রতি দিন তিনটে ঘর পেরিয়ে ওকে নিজের ঘরে ঢুকতে হবে।
বেশি দূর যেতে হয় না, একটা তীক্ষ্ণ মহিলাকণ্ঠে চমকে উঠি।

'না রজার না, এখানে না, এখানে তুমি ধূমপান করতে পারো না!' আওয়াজটার উৎস সন্ধানে তাকাই।

পরনে চাপা জিন্স, কাঁধ ছাপানো খোলা চুল গাঢ় গোলাপী রঙে ছোপানো, গলায় কাঠের মালা, ডানদিকের ভ্রু, ওপরের ঠোঁটে চকচকে স্টিলের দুল, গহনা-বিহীন হাতের দশটা আঙ্গুলে বারোটা আংটি। 'ভুলে যেও না রজার, এটা কলেজ ডর্ম, মদের বার নয়!' মহিলা ভীষণ রেগে আছেন বোঝা যাচ্ছে। আমার হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে আসে।

'আরে ছাড়ো তো! নিয়ম! কত্তো দেখলাম। হুঃ!' হাতকাটা গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে নীল-লাল-সবুজের বাহারে উল্কি দেখা যাচ্ছে। মোটা ক্যানভাসের প্যান্ট, কোমরের বেড় ছাড়িয়ে প্রায় হাঁটু অবধি চলে এসেছে, পায়ে পাতলা একটা চটি, তাচ্ছিল্য ভরা পুরুষকণ্ঠের উত্তর। 'কোন শালার বাপ বলেছে পারি না? শালা! পয়....শশশা দিচ্ছি না! এ্যই ছোঁড়া! ওই ভোগের স্মোক এলার্মের ওপর একটা তোয়ালে ফেলে দে তো! এই ব্যাটা... হুঁকোমুখো? দাঁড়িয়ে আছিস কী?'

'থামো বলছি! ভরদুপুরে মদ খেয়ে ছেলেকে কলেজে ভর্তি করতে এসেছে,' মহিলা কণ্ঠের পারদ আরো দু-খেপ উঠে আবার খাদে নেমে যায়, ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলেন, 'সোনা ছেলে আমার, মুরগী-ভাজা গুলো সময় মতো খেয়ে নিও, সসটা একটু ঝাল আছে, কলেজ জীবন উপভোগ করো, আমি...আমরা চললাম।'

'বাই টমাস!' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে রজারের।

'টমাস না ইডিয়েট! ও ম্যাথিউ! দিবারাত্র গিলে বসে আছে, শয়তান...' 'ঐ একই হলো...' রজারের পা টলছে।

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে 'হুঁকো-মুখো সোনা ছেলে ম্যাথিউ'র মুখ দেখার চেষ্টা করি, অন্ততঃ পক্ষে একটা ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ তো পেলো ছেলেটা!

'না, না! মাসি!' ইংরাজী ভাষার কোলাহলের পটভূমিকায় পরিষ্কার বাংলায় অর্কের গলা ভেসে আসে, 'একদম তাকিয়ো না, সোজা চলতে থাকো... সোজা...'

দু'টো বন্ধ ঘর। তালা লাগানো, একটা ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ। এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের জিনিস সামলে এগোতে থাকি।

'আরে! মিসেস সানইয়াল নাকি!' জুলিয়েটরর মা ডেবি স্মিথ, একেবারে চোখের সামনে, আর একটু হলে ধাক্কা লাগতো।

জুলিয়েট ঋকের সঙ্গে হাইস্কুলে পড়তো। জুলিয়েটের একটা ছোট ভাই আছে শুনেছিলাম।

'হ্যাঁ, মানে, ওই একটু......' ঘাড় ঘুরিয়ে অর্ককে দেখাতে গিয়ে দেখি ও লোকজনের পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেছে। 'জুলিয়েট ভালো তো?'

'কে জানে মাগী কোথায়? আমি এখানে এসেছি আমার ছেলে ববের জন্য', আনন্দের আতিশয্যে ডেবী আমাকে জড়িয়ে ধরে, 'খুশির কথা আর কি বলি, বব ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছে সায়ান্সে। তোমার রিকি কেমন আছে? বড্ডো ভালো ছেলেটা, সেই ছোটবেলা থেকেই কি ভদ্র, একটা মেয়ের মতো সহানুভূতিশীল, আবার একটা ছেলের মতো চৌকস, তুমি রত্নগর্ভা!' ডেবী মুখ নামিয়ে আনে কানের পাশে, 'আমার জুলিয়েটটা আমার তখনকার ছেলেবন্ধু স্টেফানের মতো বোকা ছিল! দুটোই ভেগেছে, ঢাকি সমেত প্রতিমা, তবে আমার ফিয়ান্সে রিচি, রিচার্ড, একেবারে অন্যরকম। দেবদূত, দুইমাসের আলাপেই এনগেজমেন্ট সেরে নিয়েছি, এবার বিয়েটাও করে ফেলবো, কি বলো? এইমাত্র এখানে ছিল!' ওদের দুজনের কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ ডেবি আমার দিকে ফেরে, 'কোথায় যে গেলো? তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম!'

'থাক না এখন?' চল্লিশ বছরের ডেবি দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন বিয়ে করতে চলেছে, সেই আনন্দে সামিল হই, ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, 'পরে আলাপ হবে'। ভিড় কাটিয়ে পৃথা আর অভিরূপ এগিয়ে আসছে, দেখতে পেয়েছি।

অর্কের ঘরের বাইরে এসে থেমে যাই। ওর রুমমেট আগে থেকেই চলে এসেছে মনে হচ্ছে! আর এসেই নিজের দিকের ঘরের দেওয়াল সাজিয়ে ফেলেছে। ডর্মের চুনকালি-করা দেওয়ালে ব্রুস লী'র একটা বিরাট পোস্টার, তার একপাশে ভারতীয় 'প্রকৃতি-পুরুষ' এর চাইনিজ সংস্করণ 'য়িন-ইয়াং' প্রতীক। অর্ক বাইরে দাঁড়িয়ে, মুখ দেখে আন্দাজ করি, ঘরের সাজসজ্জায় একটু ঘাবড়ে গেছে, আমি হাসি, 'আরে চিন্তার কি আছে? এক চিনাম্যান চাঁই চুই মালাই কা ভ্যাট...' ওকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক বিরাট চমক খেয়ে চুপ করে যাই। চিন সম্পর্ক আরো কিছু লঘু মন্তব্য মাঝপথে গিলে ফেলতে বাধ্য হয়েছি... আঠারো-উনিশ বছরের এক ফুটফুটে বাঙালি ছেলে।

সাজানো দেওয়ালের একধারের বিছানার ওপর বসে, চোখ বন্ধ। দু'হাত ধ্যানের মুদ্রায় কোলের ওপর ফেলা। আমাদের দেখে ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়, মিষ্টি হেসে আবার চোখ বন্ধ করে ধ্যানের মুদ্রায় ফিরে যায়। এবার আমার মুখ থেকে হইহই করে বাংলা-ইংরাজি মেশানো ক্ষমাপ্রার্থনা বেরিয়ে আসে, 'সরি সরি, একেবারে ভুল হয়ে গেছে,' তাড়াতাড়ি করে আবার বলি, 'বেলা তো অনেক হলো, ক্ষিদে পায় নি তোমার?' ছেলেটি আবার চোখ মেলে তাকায়, শান্ত স্থির দৃষ্টি, ক্রমান্বয়ে আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'না, না, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। না, আমার ক্ষিদে পায় নি।'

অভিরূপ কড়া চোখে তাকিয়ে আছে দেখে পরিস্থিতি সহজ করার চেষ্টায় বলি, 'তোমার বাবা মা সব কোথায়? তোমার জিনিসপত্র কোথায়? তোমার নাম কি?'

ছেলেটা আবার মৃদু হাসে, বলে, ‘বাবা মা? বাবা..., মা...,’ মাথা তুলে একটু ভেবে তারপর বলে, ‘সম্ভবতঃ নিচে চা আনতে গেছে। আমার জিনিষপত্র এই তো, এই যে বই-খাতা-পেন, জামা জুতো সব তো এইখানেই, ওই র‍্যাকে, আর কী দরকার? আমি জয়ন্ত ওরফে জনি রিচার্ডসন টেইলার।’ ‘ও, ভালো কথা’।

অভিরূপ আর পৃথাও এসে গেছে, আমরা সবাই মিলে লেগে পড়ি। সব ভারী জিনিসও এসে গেছে, এখন ঘরের নানা জায়গায় রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোয়েভ বসিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো চালু করতে হবে, আমি অর্কের দিকের বুক-শেলফে বই তুলি, গুছোতে থাকি। বই তো নয়! এক-একটা বড়ো বড়ো পাথর সব।

মাইক্রোয়েভের ঘড়িটা ঠিক করতে করতে বার বার আড়চোখে জনির দিকে তাকাই, কি সুন্দর ছেলেটা! ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক, কোন তাপ উত্তাপ নেই! শুধু কয়েকটা বই, আর সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে কলেজে পড়তে চলে এসেছে। আবার সটান হয়ে বসে ধ্যান করছে। দুই বিপরীতের প্রতীকী য়িন-ইয়াং টাঙিয়েছে ঘরের দেওয়ালে। জনির মাকে দেখার কৌতুহল হয়। এখনো এলো না? কি রকম ‘মা’? আমার ছেলে যখন কলেজে গিয়েছিল আমরা এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলাম। হঠাৎ ধরা পড়ে যাই। চোখাচোখি হতেই ও সম্ভ্রমের সাথে চোখ নামায়, ওকে সহজ করার জন্য বলি, ‘তুমি বাঙালি নও তাহলে?’ অর্ক বাংলা বোঝে কিন্তু কথা বলতে চায় না সহজে, ওকে শুনিয়ে ছেলেটিকে বলি ‘বেশ তো বাংলা বলো তুমি........’

ছেলেটি মাথা নাড়ে, ‘অনলাইনে এখন যে কোন ভাষা শেখা যায়, ভাবলাম মাতৃভাষাটা শিখে রাখা ভালো।’

‘তা আর বলতে? মাতৃভাষা? শেখার ইচ্ছা... অনলাইন...’ অনেক কয়টা প্রশ্নের তীর মনে ভিড় করে এসেছে, কিন্তু তার আগেই দুটি সুদর্শন সাদা চামড়ার আমেরিকান যুবককে ঘরের মুখে দেখে চুপ করে যাই।

‘হ্যালো হ্যালো, হেই....., দেখো! দেখো, লি’ল জনির রুমমেট এসে গেছে!’ রোদে পুড়ে গায়ের সাদা রঙ উজ্জ্বল তামাটে বর্ণ, মেদবিহীন লম্বা দোহারা চেহারা, পরিপাটি জামা প্যান্ট, ফেট্টি বাঁধা মাথার চুলে, পায়ে দৌড়োনোর জুতো, হাতে চায়ের কাপ। বয়স চল্লিশের বেশি না, সম্ভবতঃ জনির বড়ো দাদার বন্ধু, বিশেষ একটা পাত্তা দিই না, ওর দায়িত্বজ্ঞানহীন ‘মা’টিকে দেখার কৌতুহলটা বেড়েই যাচ্ছে!

‘রনি-জেফ্রি!’ জয়ন্তকে এই প্রথম উত্তেজিত হতে শুনি, ও অর্ককে দেখায়, ‘এই যে আমার রুমমেট অর্ক। ও বাঙালি।’

‘বাঃ, দারুণ,’ ওরা দুইজনে পালা করে জয়ন্তকে আদর করে, গালে চুমু খায়। ‘ভালো হলো, এবার তুমি প্রাণ ভরে বাংলা বলতে পারবে।’

আমাদের কাজ প্রায় হয়ে গেছে, আমরা সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াই, পরিচয় দিই, ‘সান্যাল দম্পতি, অর্কের পড়শি, ওর মা পৃথার সাথে এসেছি।’

জনি তাকায় আমাদের সবার দিকে, ছেলেদুটোকে দেখিয়ে ওর নরম গলায় বলে, ‘এ রোনাল্ড রিচার্ডসন আর ঐ জেফ্রি টেইলার,’ তারপরে আমার দিকে ওর স্নিগ্ধ ধ্যান-গম্ভীর চোখ তুলে বলে ‘আপনি তখন জানতে চেয়েছিলেন,’ তারপরে ইংরাজিতে যোগ দেয়, ‘এরাই আমার বাবা-মা।’

জনির কথা শেষ হতে না হতেই আমাদের সচকিত করে ছেলেদুটো সমস্বরে ‘ইপপি....’ বলে আনন্দের চিৎকার করে ওঠে। কোনোরকমে আমাদের বাড়ানো হাতে হাত ছুইয়ে পরিষ্কার বাংলায় ‘নমস্কার’ বলে ছেলেগুলো এইবার সমবেত ভাবে হোহো হাহা করে হেসে ওঠে।

'বাবা-মা? বা...বা ...মা? ...লি'ল জনি? আমি মা, আমি মা কিন্তু, ... প্লীজ! আর আমাদের রনি? ও জনির বাবা। ঠিক তো?' সঙ্গে সঙ্গে রনিও প্রতিবাদ করে ওঠেছে, 'কক্‌খনো! স্বপ্ন দেখছো! না, না জেফ তুমি বাবা, আমি মা, জনি ছোটবেলায় আমায় মা বলতো!'

'তখন ও সবে একমাসের!'

'তখন তোমার লম্বা চুল ছিল!'

'তুমি রান্না ঘরে শিস দিয়ে গান করো!'

'তুমি লাল রঙের সোয়েটার পরো!'

'তুমি ট্রমবোন বাজাও!'

ওরা একে ওপরকে নানা তুচ্ছ কারণ ধরে খ্যাপাতে থাকে আর নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে জোরে জোরে হাসতে থাকে। ওদের সঙ্গে হাসিতে জনিও যোগ দেয়। যেন কি একটা ভীষণ মজার কথা বলা হয়েছে।

জনির উজ্জ্বল চোখে মুখ ভরা হাসি, জেফ্রি আর রনির সমবেত আনন্দোছ্বাস মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সেই গভীর মঙ্গলময় অনুভূতি আমায় আচ্ছন্ন করে দেয়, আমি সেই তৃপ্তির আবেশে ভাসতে থাকি।

আর তখনি বিদ্যুৎচমকের মতো সেই আনন্দময় কুয়াশার মতো ভিতর থেকে আমার একমাত্র সন্তান ঋকের মুখ ভেসে ওঠে। আমি ঋককে, আমার সন্তান রিকিকে দেখতে পেয়েছি জেফ্রি আর রনির অনাবিল স্বাভাবিকতায়।

এতক্ষণে ও ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়েছে, পরিপাটি করে বিছানা তুলে, নিখুঁত হাতে কফি ঢেলে, প্রাতঃরাশ খাচ্ছে। হাসিখুশী, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত।

আমি একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনের গভীরতম সুড়ঙ্গে, কঠিনতম সিন্দুকে লুকিয়ে রাখা অনেক গুলো কঠিন প্রশ্নের জবাব একটা উত্তরেই পেয়ে গিয়েছি। ঋকের শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, মুখোমুখি হয়েছি যেই প্রশ্নগুলির, এবং তার উত্তর জানতে পেরেও মানতে পারি নি, তাকে আজ চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। একটা কঠিন ভার নেমে যাচ্ছে আমার বুক থেকে।

চমক ভাঙ্গে অভিরূপের কনুইয়ের একটা ছোট্ট ধাক্কায়। ও ইশারায় বলে, 'কাজ শেষ। চলো এবার।'

পৃথা নেমে গেছে, অভিরূপ আবার ড্রাইভারের সিটে। দেড়ঘন্টার রাস্তা। সূর্য মধ্যগগনে, তবুও কি কারণে জানি না, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় মনটা ভরে আছে। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে হঠাৎ অভিরূপ বলে ওঠে, 'ওরা বেশ আছে না?'

আমি চমকে উঠি, 'কারা?'

'ওই যে গো, ওরা, রোনাল্ড আর জেফ্রি?'

আমি সম্মতির মাথা নাড়ি। ও যা ভাবছে আমিও এই মুহূর্ত হয়তো ঠিক তাই ভাবছি? অভিরূপ হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ওর কোলে তুলে নেয়। 'হ্যাঁ গো, যা বলেছো।' আমার গায়ে শিহরণ জাগে, একটা চেনা অনুভূতি, আমি ওর পিঠে হাত রাখি। আমার হাতের ছোঁয়ায় ও কেঁপে ওঠে।